লোককাহিনি ও পুরুষতন্ত্র
নারীর লিঙ্গায়িত সামাজিক পরিচয় নির্মাণ ও স্বতন্ত্র স্বর

সুস্মিতা চক্রবর্তী

ভূমিকা

অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-অনুমোদিত মূল্যবোধের আলোকেই সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের নির্মাণ ঘটে থাকে। এই নির্মাণ অক্ষর-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মধ্যে যেমন প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তেমনি এর বাইরের অক্ষর-বঞ্চিত স্বশিক্ষিত বৃহত্তর লোকসমাজের পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ও পরিচর্চিত সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতেও ঘটে থাকে। যেকোনো দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি সমৃদ্ধ উৎস হলো মৌখিক সাহিত্য বা কথ্য-পরম্পরা, যার মধ্য দিয়ে সমাজের কেন্দ্রীয় মূল্যবোধগুলো আদানপ্রদান করা হয়; এবং এই সমাজ-নির্দেশিত মূল্যবোধগুলোকে বারবার চর্চার মধ্য দিয়ে লোকসমাজে এগুলোকে আরো শক্তিশালী করে তোলা হয়। কথ্য-পরম্পরার অন্তর্গত জনপ্রিয় প্রবাদে যখন বলা হয় : 'পুরুষের রাগে বাদশা, নারীর রাগে বেইশ্যা' বা 'গাইয়ের বিটি, বউয়ের বেটা তবে জানবে কপাল গোটা'— তখন এই সমস্ত প্রচলিত কথ্য-পরম্পরা থেকে সমাজে নারী-পুরুষের লিঙ্গীয় বৈষম্যটি সহজে টের পাওয়া যায়। কথ্য-পরম্পরার অন্তর্গত এরকম আরো অসংখ্য-অজস্র উদাহরণ আছে, যেগুলো পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোকে তুলে ধরে। ফোকলোরের বিদ্যায়তনিক পরিসরে লোককথা-লোককাহিনি-লোকগল্প, লোকপুরাণ-কিংবদন্তি— মৌখিক সাহিত্যের এসব উপাদানকে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা একটি বর্গে বিন্যস্ত করে একে বলেছেন মৌখিক কথকতা। (খান, ২০০১: ৯) পরম্পরাক্রমে প্রচলিত মৌখিক কথকতাগুলোয় লেনদেনের মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গীয় ভূমিকাগুলো বিশেষভাবে পরিবাহিত হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ করে, আমাদের দেশে, লোককথা-অধ্যয়নের লিঙ্গীয়ধারা তেমনটা গড়ে ওঠে নি, যেমনটা কিনা ইউরোপে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আমাদের সংস্কৃতির যে অধিপতি-দৃষ্টিভঙ্গি সেটা সার্বিকভাবে একটা পুরুষপরিপ্রেক্ষিত হাজির করে— এটাকেই গবেষকরা 'পুরুষকেন্দ্রিক ভাবাদর্শ' বা 'পুরুষতন্ত্র' বলেছেন। এই পুরুষতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে জগৎকে দেখাটা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে, সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং বেশিরভাগ লোক সেটাকেই আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছে, তারা যে শ্রেণিরই হোক না কেন। (লিভসে, ১৯৯০: ১৬) সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ও একটি অধিপতিশীল প্রতিষ্ঠান, যেখানে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের আলোকে সাধারণত এর পাঠ্যক্রম-গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে। ফোকলোর অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এই একই পরিস্থিতি-পরিপ্রক্ষিত কাজ করেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিটাকে রূপান্তরের প্রচেষ্টায় আর ফোকলোর-অধ্যয়নের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, লিঙ্গীয় বিষয়-আশয়ের পঠন-পাঠন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়ে থাকে। সেদিক থেকে, আলোচ্য প্রবন্ধটিতে লোককাহিনিতে নারীর লিঙ্গীয় নির্মাণগুলো উপস্থাপনের পাশাপাশি নারীকথকের মৌখিক-কথকতায় অপ্রচলিত (পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-মূল্যবোধের বাইরে) কিন্তু নারী-পরিবেশিত লোককাহিনির বয়ানে নারীর নিজস্ব স্বরও তুলে ধরা হবে।

উদ্দেশ্য

বর্তমান সময়ে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও ফোকলোর পঠনপাঠনের এলাকায়, লোককাহিনির লিঙ্গীয়-বিশ্লেষণধর্মী আলাপ-আলোচনা-গবেষণা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই ধরনের পঠনপাঠনের বাস্তবিক প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। আলোচ্য প্রবন্ধটি তাই লোককাহিনি-অধ্যয়নের লিঙ্গীয়-বিশ্লেষণধর্মী একটি স্বতন্ত্র ধারার

সূচনা ঘটাবে।

পদ্ধতি

প্রবন্ধটিতে রাজশাহী জেলা থেকে সংগৃহীত সাতটি লোককাহিনি লিঙ্গীয়-প্রপঞ্চ-পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি লোককাহিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের শিক্ষার্থীদের (২০০৫-'০৬ শিক্ষাবর্ষের ফোকলোর বিভাগের শিক্ষার্থী সাহানা পারভিন সুমি, মোস্তারি খানম মনিরা ও সমীর দাস) 'ক্ষেত্রসমীক্ষা ও প্রতিবেদন' থেকে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া একটি লোককাহিনি, যা লোকধর্ম-পরিসরে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপরীতে নারী-পরিবেশিত লোককাহিনির মধ্য দিয়ে নারীর নিজস্ব স্বর তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে, সেটি লেখকের প্রত্যক্ষ মাঠ-গবেষণা থেকে সংগৃহীত। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণপদ্ধতির আলোকে মাঠ-গবেষণাটি সম্পাদিত হয় ২০০৬ সালের ৮ জুন রাজশাহী জেলার জামালপুরস্থ ওলিবাবার মাজারে। মাজারে আগত লোকধর্ম-সাধক রসেনা পাগলির কাছ থেকে লেখক লোককাহিনিটি সংগ্রহ করেন। প্রবন্ধে ব্যবহৃত লোককাহিনিগুলোর পূর্ণাঙ্গ রূপ ও কথকের পরিচয় লেখার শেষে পরিশিষ্ট-আকারে হাজির করা হয়েছে।

লোককাহিনির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গীয় প্রত্যাশাগুলো আমাদের সমাজের আরো অনেক কিছুর মতো লোককাহিনিগুলোতেও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, যেখানে পুরুষ-আধিপত্যশীল ক্ষমতা-কাঠামো বজায় রাখতে লোককাহিনিগুলো অহরহ অধস্তন নারীদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও পরস্পরের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছবি আঁকে।

লোককাহিনিগুলোতে নারীর ভূমিকা তার ঘর-গৃহস্থালিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। নারীর মুখ্য ভূমিকা থাকে তার মাতৃত্বে বা সন্তানধারণে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানধারণে অক্ষম নারীরা পারিবারিক-সামাজিক পরিসরে যথেষ্ট নিগৃহীত হয়ে জীবন কাটায়। আবার সন্তানবতী নারীদের ক্ষেত্রেও ছেলেসন্তান উৎপাদন করতে না-পারার সমস্ত দায়ভাগ নারীকেই মেনে নিতে হয়। পুত্রের আশায় কর্তৃত্বপরায়ণ পুরুষ বারবার বিবাহ করার বৈধতা পায়। যদিও নারীর বেলায় একগামিতাই নির্ধারিত হয়। সন্তান না-হওয়ার দায়ভাগ নারীর তুলনায় পুরুষের ওপর সামাজিকভাবে বর্তায় না। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধে বেড়ে ওঠা নারীরা সন্তানবতী না-হওয়াকে নিজেদের ব্যর্থতা বলে মনে করে। ফলে, লোককাহিনিতে যে নারী স্বামীর অন্যান্য স্ত্রীর সঙ্গে সদাসর্বদা প্রতিহিংসা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত থাকে, সেই নারীই কখনো আবার স্বামীর দ্বিতীয়বার বিয়ে করায় ভূমিকা রাখে।

আমাদের সমাজে নারীরা সাধারণভাবে মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে বা মেয়ে হিসেবে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থেকে সমাজে অধস্তন ভূমিকা পালন করে চলে। নারীর জন্য শারীরিক সৌন্দর্য প্রধান বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে পুরুষের জন্য কেবল ক্ষমতাই প্রধান-নিয়ামক। পুরুষতান্ত্রিক-সমাজ নারীদের দুই ভাগে বিভক্ত করে দেখে— 'ভালো নারী' ও 'মন্দ নারী'। ভালো নারীর চারিত্রিক গুণাবলি হিসেবে যুক্ত হয় তার প্রজননক্ষমতা, দয়ার্দ্রতা, উদারতা আর শারীরিক সৌন্দর্য (Furniss, G. & Grunner, L, 1995: quoted: Susan Weinger, Lotsmart Fonjong, Charles Fonchingong & Roberta Allen 2006:16-26)। রূপকথায় আমরা অনেক 'ভালো নারী'-'সতী নারী' আর 'মন্দ নারী'-'অসতী নারীর' সন্ধান পাই। রূপকথার ডাইনি চরিত্রে নারীদের অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যারা ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও যাবতীয় মন্দ কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। রূপকথাগুলোতে ডাইনি এমন একটা ক্যাটাগরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে শুধু নারীদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; পুরুষদের নয়। পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শের আলোকে ইউরোপের আর আমাদের দেশের রূপকথায় এই ডাইনি চরিত্র নির্মিত হয়েছে। অথচ ইতিহাস এ বিষয়ে ভিন্ন স্বাক্ষ্য দেয় :

> ইউরোপের সামন্তযুগে রাজা ও চার্চের একটানা স্বৈর-আধিপত্য যখন নানাভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিল এবং এগুলোকে দমন করবার জন্য যখন নারকীয় পথ অবলম্বন করা হয়েছিল, তখনই সৃষ্টি হয় প্রতিবাদী বা নিয়ম ভঙ্গকারী নারীকে ডাইনি আখ্যা দিয়ে হত্যা করার অযুত ঘটনা। সবচাইতে গ্রহণযোগ্য সংখ্যা হচ্ছে ৬০ লাখ। যুদ্ধ ছাড়া এটিই সবচাইতে ব্যাপক গণহত্যা। (গরবং, ১৯৮৬: ৮০-১১০, উদ্ধৃত: আনু মুহম্মদ, ১৯৯৭: ১৫)

আবার ভারতের কিছু কিছু আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও ব্যাপকহারে ডাইনি অপবাদে নারীহত্যার ঘটনা ঘটেছে

(মল্লিকা সেনগুপ্ত, ১৯৯৪: ৯৪)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শের খড়্গের বিপরীতে একদা যেসব নারী বিদ্রোহ করে সমাজের অধিপতি শ্রেণির হাতে নৃশংসভাবে হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন, তারাই পরবর্তীকালের পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শে নির্মিত সাহিত্যে 'ডাইনি' হিসেবে চিত্রায়িত হলেন, আর এভাবে আড়াল হলো পিতৃতান্ত্রিক বর্বরতা। (সুস্মিতা চক্রবর্তী, ২০০৭) শুধু রূপকথায় নয়, পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা-ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে, আমাদের মৌখিক-কথকতার অন্যান্য ক্যাটাগরির লোককাহিনিগুলোর নারী-নির্মাণও আধিপত্যশীল সমাজ-মূল্যবোধের নিরিখে ঘটেছে।

শিশুরা গল্পের মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভ করার পাশাপাশি সমাজের নারী-পুরুষের লিঙ্গীয় আচরণসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে, আর একই ধরনের পুরুষতান্ত্রিক লিঙ্গীয় ধ্যানধারণা লোককাহিনিগুলোতে পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের প্রচলিত লিঙ্গীয় নির্মাণটি ক্রমে শিশু-কিশোরদের মগজে-মননে পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে।

পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের আলোকে লোককাহিনিগুলো তৈরি হওয়ায় এখানে পুরুষ অপেক্ষা নারীকে বেশি করে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। বাস্তবে, আমাদের সমাজে আধিপত্যশীল ক্ষমতা-কাঠামো টিকিয়ে রাখতে পুরুষেরা সমাজের প্রায় সকল স্তরে ক্ষমতার লিঙ্গীয়-রাজনীতি বজায় রাখে। ফলে, লোককাহিনিতে নারীদের বোকামি, অন্যায়, হিংসা, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নিষ্ঠুরতা ও পুরুষ কর্তৃক তাদের শাস্তিদান ইত্যাদি বিষয়গুলো যেভাবে ব্যাপকহারে হাজির হয়, পুরুষের ক্ষেত্রে একই বিষয় কিন্তু পুরুষতন্ত্রের আড়ালে চাপা পড়ে থাকে। বাস্তব সমাজে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক ভালোবাসা, সহযোগিতা-সংহতি থাকে। কিন্তু লোককাহিনির নারীর থাকে কেবল হিংসা। নারীদের দাস্য-মনোভাব লোককাহিনিতে এমনভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যে, পুরুষের কাছে অধিকতর কাম্য হয়ে ওঠার নিরন্তর চেষ্টায় রত নারীরা পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠুর-প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে দ্বিধা বোধ করে না।

আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্লেষিত লোককাহিনিগুলোর মধ্য দিয়ে লিঙ্গীয় বার্তা কীভাবে বাহিত হয় সে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে :

ক. লোককাহিনিতে নারীদের দুর্ভাগ্যজনক পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও প্রতিহিংসা চরিতার্থতা;

খ. পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-পরিবারে সন্তানহীন নারীর নিদারুণ সংকট ও পুরুষের প্রতি নারীর দাস্য-মনোভাব;

গ. নারীদের 'ভালো' ও 'মন্দ' এই দুই ক্যাটাগরির মধ্যে বিভাজিত করে ও নারীকে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল-বোকা প্রতিপন্ন করে পক্ষান্তরে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধাশ্রিত নারী-চরিত্র স্থাপনা;

ঘ. প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক বলয়ে বাস করেও নারী-পরিবেশিত লোককাহিনিতে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপরীতে নারীর স্বাধীন স্বরের উপস্থিতি।

রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলা থেকে সংগৃহীত সাত ভাই ও ময়না (পরিশিষ্ট ১) লোককাহিনিটির মূলসুর হলো নারীতে-নারীতে প্রতিহিংসা-ক্রূরতা-নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত সব প্রতিচ্ছবি, যেখানে সাত নারী অর্থাৎ লোককাহিনির সাত ভাবী যৌথভাবে তাদের একমাত্র ননদ ময়নাকে কখনো ঢেঁকিতে ফেলে, কখনো আগুনে পুড়িয়ে, কখনো পানিতে ফেলে দিয়ে হত্যা করে এবং অলৌকিকভাবে ময়না মেয়েটি কখনো আমগাছ হয়ে, কখনো শিমগাছ হয়ে, আবার কখনো শাপলাফুল হয়ে বেঁচে যায়। অবশেষে সাত ভাইয়ের অলৌকিক স্পর্শে তাদের বোন মনুষ্যরূপ লাভ করে। সাত ভাই বোনের হত্যাকারীদের শাস্তি দেয় তাদের মাটিচাপা দিয়ে, অর্থাৎ সাত ভাই তাদের বউদের হত্যা করে। লোককাহিনিটিতে নারীদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টাগুলো এত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এসেছে যে, সাত ভাই কর্তৃক তাদের স্ত্রীদের মাটিচাপা দেয়াটা কাহিনিটির পরিণতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে অনেকখানি স্বাভাবিক করে তোলা হয়। নারীদের প্রতিহিংসার চেহারাটি জোরালভাবে লিঙ্গীয় বার্তা হিসেবে টিকে থাকে। আবার, একই ধরনের লিঙ্গীয় বার্তা বহন করে রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার কুটিপাড়া থেকে সংগৃহীত অপর একটি লোককাহিনি শাপলাবতী (পরিশিষ্ট ৪), যেখানে শাপলাবতী মেয়েটিকে তার সাত ভাবী স্বামীদের অনুপস্থিতিতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে কখনো মাটিতে পুঁতে ফেলে, কখনো পানিতে ফেলে দেয় আর প্রতিবারই শাপলাবতী অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় কখনো গাছ হয়ে কখনো নদীতে শাপলা হয়ে। অতঃপর ভাইদের হাতে শাপলাবতী শাপলাফুল থেকে মানুষ হয়। ভাইয়েরা বোনের হত্যাকারী তাদের স্ত্রীদের শাস্তিস্বরূপ মাটিচাপা দেয়। এই লোককাহিনিটিতেও নারীদের প্রতিহিংসাপরায়ণতার ভয়ংকর রূপ ফুটে উঠেছে। কুঠার আর রাজার মেয়ে (পরিশিষ্ট ২) লোককাহিনিতে দেখা যায়, রাজার ছয় রানি নিঃসন্তান হওয়ায় রাজা সন্তান

লাভের আশায় সপ্তমবারের মতো বিয়ে করে। ছোট রানি সন্তানপ্রসবা হলে ছয় রানি যৌথভাবে চক্রান্ত করে রাজাকে বাণিজ্যে পাঠিয়ে ছোট রানির ওপর তাদের নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। গোটা কাহিনি জুড়ে নারীদের প্রতিহিংসাপরায়ণতার ভয়ংকর ছবি চিত্রিত হয়। রাজা এবার এক কাঠুরের মেয়েকে বিয়ে করে। এবার ছোট রানি সন্তানপ্রসবা হলে বাকি ছয় রানি রাজাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাণিজ্যে পাঠায় আর ছোট রানির ওপর নিজেদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তার ছয় কুড়ি একটি সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে কাঠের পুতুল হাজির করে প্রমাণ করে যে ছোট রানি কাঠের পুতুল প্রসব করেছে। সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হওয়ায় রাজা তখন ছোট রানিকে তাড়িয়ে দেয়। এরপর ঘটনাপরম্পরায় ছয় রানির ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হয়, রাজা কর্তৃক ছয় রানির শাস্তি প্রদান ও ছোট রানি আর তার সন্তানসহ রাজার সঙ্গে তাদের মিলন ঘটে। সন্তান উৎপাদনই যে রানিদের তথা নারীদের মুখ্য কাজ আর তাকে কেন্দ্র করে রানিদের পারস্পরিক প্রতিহিংসার চরম প্রকাশ তা এই লোককাহিনিতে তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়।

রাজশাহী জেলার পবা থানার বড়গাছি গ্রাম থেকে সংগৃহীত সুয়ো-দুয়ো রানি (পরিশিষ্ট ৩) লোককাহিনিটিতে নারী চরিত্র দুভাগে বিভক্ত— সুয়ো আর দুয়ো। দুই রানির পারস্পরিক হিংসা-দ্বন্দ্ব, দুয়োরানির সহ্যপরায়ণতা ও পুরস্কার লাভ, সুয়োরানির অবাধ্যতার শাস্তি লাভের মধ্য দিয়ে দুয়োরানির সঙ্গে রাজার সুখে বসবাস সম্ভব হয়। লোককাহিনিটিতে রাজা বা পুরুষ-চরিত্রটি স্বাধীন আর রানি বা নারী-চরিত্রগুলো প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত রাজা বা পুরুষ-চরিত্র কর্তৃক। রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার কুটিপাড়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত কৃষকের মেয়ে (পরিশিষ্ট ৫) লোককাহিনিটিতে দেখা যায়, কৃষকের মেয়ের ওপর তার সৎমায়ের অত্যাচার চলে। অবশেষে মেয়েটি 'সুন্দরী' আর 'সহ্যপরায়ণ' গুণাবলির জন্য পুরস্কৃত হয়, রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিপরীতে সৎমায়ের নিজের মেয়ে 'তেমন সুন্দরী নয়', মেয়েটিসহ তার মায়ের রাজা কর্তৃক শাস্তি-প্রাপ্তি ঘটে। আবার, রাজশাহী জেলার পবা থানা বড়গাছি গ্রাম থেকে সংগৃহীত কৃষক ও তার বোকা স্ত্রী (পরিশিষ্ট ৬) লোককাহিনিতে পুরুষ কর্তৃক নারীর বোকামিকে হাস্যকরভাবে হাজির করা হয়েছে, যেখানে শেষপর্যন্ত মিথ্যুক পুরুষের বুদ্ধির জয় ঘোষিত হয়েছে। লোককাহিনিতে কৃষকের স্ত্রীর আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে যে বার্তাটি তীব্রভাবে তুলে ধরা হয়েছে সেটি হলো : নারী বোকা, তারা পেটে কোনো কথা গোপন রাখতে পারে না, সেটা যতই তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট হোক। ফলে নারীর বোকামির কারণেই সংসারে অনিষ্ট ঘটে। বিপরীতে পুরুষ বুদ্ধিমান-চতুর। তার বুদ্ধির জোরেই যাবতীয় ঝামেলা দূর হয়ে সংসারে শান্তি ফিরে আসে। নারী সেখানে নিষ্ক্রিয়, পুরুষটি কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নারীর বোকামির বিপরীতে সংসারের সমস্যা-সমাধানকারী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে, বোকা কৃষকের স্ত্রী সকলের কাছে হাস্যকর-পাত্রী হিসেবে পুরুষতন্ত্র কর্তৃক নেতিবাচকভাবে স্থাপিত হয়েছে।

উপরে আলোচিত ছয়টি লোককাহিনির নারী-চরিত্রগুলো ভালো-মন্দ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সদাসর্বদা আবদ্ধ। কখনো নারীরা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-পরিবারে সতীনে-সতীনে, কখনো সৎমা আর মেয়েতে লিপ্ত থেকেছে প্রতিহিংসা-নিষ্ঠুরতায় আর নিপীড়নের মধ্য দিয়ে। পুরুষের জন্য সন্তান, বিশেষ করে ছেলেসন্তান উৎপাদনের গুণাবলিই শেষপর্যন্ত নারীদের লিঙ্গীয় পরিচয় নির্মাণে বেশি করে বিবেচিত হয়েছে। লোককাহিনিতে নারীর মর্যাদা পুরুষের তুলনায় খুবই কম, আর এসবে যে নারীচরিত্রগুলো এসেছে তারা নানাভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্প্রীতিতে নয় বরং সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধে আবদ্ধ নারী সমাজ-সংসারে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্যে বসবাস করে। ফলে প্রচলিত এই সম্পর্কগুলোতে নারী থাকে ক্ষমতার নানা টানাপোড়েনে ধ্বস্ত। দেখা দেয় নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এই সংঘাত নারীতে-নারীতে যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় পুরুষে-পুরুষে বা নারী-পুরুষেও। পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামোতে নারীতে-নারীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকলেও তাতে সংহতিও কম দেখা যায় না। কিন্তু লোককাহিনিগুলো সাধারণভাবে নারীদের নেতিবাচক দিকগুলোই বেশি করে তুলে ধরে— পুরুষের নয়। অথচ, আমরা জানি, নারীদের পারস্পরিক সংহতিই পৃথিবীজুড়ে নারীদের পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ে যাবার সাহস-শক্তির জোগান দিয়েছে। অথচ, প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধাশ্রিত লোককাহিনিগুলো নারীদের শক্তিমত্তাকে সাধারণত তুলে ধরে না বরং নারী সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক গৎবাঁধা ধ্যানধারণাগুলোই তুলে ধরে।

লোককাহিনিতে যখন নারীর ভিন্নস্বর নির্মিত হয়

রাজশাহী জেলার জামালপুর থেকে সংগৃহীত আইনাল হক-আয়নাবিবি (পরিশিষ্ট ৭) লোককাহিনিটিতে নারীর লোকধর্মীয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চিত্র ফুঠে ওঠে, যেখানে আধিপত্যশীল পুরুষ নারীর ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিতে

বাধ্য হয়। অথচ, বাস্তবে, আমাদের লোকধর্ম-পরিসরে নারীকে পুরুষের চাইতে কম ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব দেয়া হয়। লোকধর্ম-পরিসরে নারী কখনো গুরু হতে পারে না, এটা পুরুষের জন্যই কেবল বরাদ্দ থাকে। লোকধর্মের নারীরা পুরুষের মতো আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেবল নারী পরিচয়ের কারণে পুরুষের মতো ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। লোকধর্মের পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ নারীর ওপর আরোপ করে বিধিনিষেধ। মাজার-সংশ্লিষ্ট লোকধর্মের গুরুস্থানীয় নারী রসেনা পাগলির সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে তাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, লোকধর্মে নারী গুরু হতে পারে কি না— তখন তিনি এ বিষয়ে তার মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে অলোচ্য লোককাহিনিটি বয়ান করেন, যেখানে আয়নাবিবির আধ্যাত্মিক-ক্ষমতা উপলব্ধি করে তার ভাই আইনাল হক আয়নাবিবিকে গুরুপদে বরণ করে নেয়। লোককাহিনিতে আয়নাবিবি চরিত্রটি নারী-ক্ষমতাকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। আর আইনাল হক আয়নাবিবিকে নিজের গুরুরূপে স্বীকৃতি দিয়ে আসলে লোকধর্মের প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক-ইতিহাসের বিনির্মাণ ঘটিয়ে নারীর স্বতন্ত্র স্বর প্রতিষ্ঠা করেছে। আলোচ্য লোকাহিনিটির কথক রসেনা পাগলি লোকধর্মের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি মনে করেন, লোকধর্মে নারী-পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই। পুরুষের মতো নারীও আধ্যত্মিক ক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে পুরুষের পাশপাশি গুরু হতে পারে। বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতেই তিনি আলোচ্য লোককাহিনিটি তুলে ধরেন। এভাবে লোকধর্মের প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে অবস্থান করেও রসেনা পাগলির কণ্ঠে নারীদের স্বতন্ত্র-ইতিহাস টিকে থাকে। লোককাহিনিটি উপস্থাপন শেষে চমৎকার বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তিনি খারিজ করেন লোকধর্ম-সংশ্লিষ্ট প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক একপেশে মূল্যবোধ :

> এখানে বলতিছে দলিলে [মারিফতের শাস্ত্রে] যে মহিলার হাতে মুরিদ হওয়া যাবে মারিফাতে বুলছে। আর শরীয়তে বুলছে বাপ হইল বেটা ছাওয়াল, বাপের হাতে মুরিদ না হইলে মায়ের হাতে হওয়া যাবে না। দুইডি পাল্লাপাল্লি চলে। এখন যাই যেইডি বুঝে তাই সেইডি লাইড়ি চাইড়ি খাক। (রসেনা পাগলি : ২০০৬)

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, আমাদের লোককাহিনিগুলো সাধারণভাবে যেমন নারীদের পারস্পরিক প্রতিহিংসার প্রতিচ্ছবি আঁকে; আবার অপর দিকে, নারী-পরিবেশিত লোককাহিনির মধ্য দিয়ে কখনো কখনো নারীদের নিজস্ব স্বরও প্রতিষ্ঠিত হয় পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের পাশাপাশি, যেমনটা উপরের আইনাল হক ও আয়নাবিবি নামক লোককাহিনিটিতে ঘটেছে। লোককাহিনির লিঙ্গীয়-বিশ্লেষণ প্রচলিত সমাজে নারী-পুরুষের লিঙ্গীয় আচার-আচরণ যেমন তুলে ধরতে পারে, আবার পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী-পুরুষের যে ক্ষমতার রাজনীতি সেটিও সমাজের অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো লোককাহিনিতেও কীভাকে পরিবাহিত হয় সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। আবার নারী-পরিবেশিত লোককাহিনির স্বতন্ত্র টেক্সটের সন্ধান-বিশ্লেষণ-গবেষণা লোককাহিনি-অধ্যয়নের লিঙ্গীয়-বিশ্লেষণমূলক ধারাটিকে ভিন্নভাবে তুলে ধরতে পারে।

উপসংহার

লোকসমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ফোকলোর লোকসমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাশাপাশি লোকসমাজের নারী-পুরুষের লিঙ্গীয় পরিচয় তুলে ধরে। সমাজের বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক-মূল্যবোধ ফোকলোরের মধ্য দিয়ে পরম্পরাক্রমে যেমন প্রবাহিত হয়ে থাকে, আবার অধিপতিশ্রেণির বাইরের প্রান্তিক-সমাজ-গোষ্ঠীর বিকল্প মূল্যবোধগুলোও ফোকলোরের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়ে থাকে। সেদিক থেকে স্রেফ সাহিত্যের উপাদান-উপকরণ হিসেবে এর গবেষণা নয়, বরং লোকসমাজের সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে এর পাঠ বা গবেষণা অধিকতর যথাযোগ্য হয়ে ওঠে। লিঙ্গীয় বিষয়-আশয়ের সঙ্গে যুক্ত করে লোককাহিনিগুলো বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমাজের পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত মূল্যবোধের আলোকে কীভাবে লোককাহিনিতে নারী-পুরুষের লিঙ্গীয় নির্মাণ ও নারীর স্বতন্ত্র স্বর জারি থাকে, তার প্রাথমিক পর্যালোচনা-বিশ্লেষণ আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তুলে ধরা হলো। ভবিষ্যতে এ ধরনের আরো বিস্তৃত গবেষণা সম্পাদিত হলে লোককাহিনি-অধ্যয়নের লিঙ্গীয় বিশ্লেষণের নতুন ধারাটি (বিশেষ করে, আমাদের দেশের ক্ষেত্রে,) আরো বিকশিত হবে।

সুস্মিতা চক্রবর্তী সহযোগী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। chaka_66@yahoo.com

তথ্যসূত্র

আনু মুহম্মদ (১৯৯৭)। *নারী পুরুষ ও সমাজ*। ঢাকা: সন্দেশ।

মল্লিকা সেনগুপ্ত (১৯৯৪)। *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

শামসুজ্জামান খান (২০০২)। "মুখবন্ধ" *গতিলোক থেকে নির্বাচিত ক্যাম্বোডিয়ার লোককাহিনী*। (মূল: মুরিয়েল পাসকিন ক্যারিসন ও ভেনারেবল কং চিয়ান), (ভাষান্তর: জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ) ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

সুস্মিতা চক্রবর্তী (২০০৭), "ফোকলোর ও জেন্ডার প্রসঙ্গ", *ফোকলোর জার্নাল*, (ড. সাইফুদ্দিন চৌধুরী সম্পাদিত) সংখ্যা ৩, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ফোকলোর বিভাগ।

রসেনা পাগলি (৮ জুন ২০০৬), লেখক কর্তৃক গৃহীত অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার থেকে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : ওলিবাবার মাজার, জামালপুর, রাজশাহী।

Furniss, G. & Grunner, L. 1995.*Power, marginality, and African oral literature*. London: Cambridge University Press.

Livesay, Jenifer (1990), "Gender Issues in Folklore Fieldwork" in George H. Schoemaker (ed.) *The Emergence of Folklore in Everyday Life.* Bloomington: Indiana.

Mies, Maria. (1986), *Patriarchy and Accumulation on a World Scale*. New Jersy.

Susan Weinger, Lotsmart Fonjong, Charles Fonchingong & Roberta Allen (2006), "Unmasking women's Rivalry in Cameroonian Folktales", Nordic Journal of African studies, pp. 16-26, www.njas.helsinki.fi/pdf-files/vol15num1/weinger.pdf

সাত ভাই ও ময়না

এক দেশে ছিল একটা মেয়ে ও তার সাত ভাই। ঐ মেয়ের নাম ছিল ময়না। ময়নার সাত ভাই বিদেশ গ্যাছে। একদিন ওর সাত ভাবী ঢেঁকিত ধান ভাঙ্গছে, তখন ময়নাক ডাইকা বুলছে ময়না আসো তো, তোমার ঘাড়ডা ঠিক কইরা দেই। এই বুইলা ময়নাকে ঢেঁকিতে পাড়াইয়া মাইরা ফেলছে। ঘাড়সহ ওক ভইঙ্গা পাশটানে ফেইলা দিছে। সেইখানে একটা আম গাছ হইছে। গাছভর্তি আম ধইরছে। লোকজন আম ছিঁড়তে গ্যাছে তখন গাছ বুইলছে : 'ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না ভাই, বাপ মইরছে চাল নামাইতে, মা মরছে শুকে; সাত ভাবী যুক্তি কইরা ঢেঁকিত ফেইলা কুটে'। সাত ভাবী শুইনতে পাইয়া ওকে কাইটা শুকাইয়া পুড়াইয়া ছাই বানাইছে। ছাই পুকুরের ধারেত ফেলছে। ঐখানে একটা শিমের গাছ হইছে। মানুষ শিম নামাইতে যায় তখন বুলে, 'ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না ভাই, বাপ মইরছে চাল নামাইতে, মা মরছে শুকে; সাত ভাবী যুক্তি কইরা ঢেঁকিত ফেইলা কুটে'। তখন ভাবীরা ওখান থেইকা তুইলা পানিত ফেইলা দিছে। নদীতে শাপলা হইয়া ফুইট্ছে। সাত ভাই বিদেশ থেইকা ফিরছে নদী দিয়া। তখন ছোট ভাই বুইলছে, ভাই ফুলডা বইন ময়নার লিগা ল্যাও। যেই ফুল ছিঁড়তে গ্যাছে ওমনি বুইলছে, 'ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না ভাই, বাপ মইরছে চাল নামাইতে, মা মরছে শুকে; সাত ভাবী যুক্তি কইরা ঢেঁকিত ফেইলা কুটে'। ভাইরা ফুলডা ছুঁতেই মানুষ হইয়া গ্যাছে। তখন ময়না সব কথা ওর ভাইদের বুইলছে। ভাইরা বাড়িত যাইয়া ভাবীদের কাছে বোনের কথা জাইনতে চাইছে। ওরা নানাভাবে তখন কাটায়ে দিছে। সাত ভাই বিশাল গর্ত কইরছে। তখন ওদের বউদের বুইলছে, দ্যাখো তো আমরা যে মালপত্র আইনছি এর মধ্যে [গর্তের মধ্যে] ঢুইকপে নাকি? যেই ভাবীরা গর্ত দেখতে উঁকি দিছে তখনই সাত ভাই ওদের ধাক্কা দিয়া গর্তের মধ্যে ফেইলা দিয়া মাটিচাপা দিছে। ভাবীরা সকলে মইরা গ্যাছে। তখন ভাইবোনে সুখেশান্তিতে বাস করতে লাইগছে।

কথক : রাজশাহী জেলার পবা থানার বড়গাছি গ্রামের মোছাঃ জইমুনা

রাজা আর কাঠুরের মেয়ে

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার ছয় বউ ছিল। এরা সকলেই বাঁজা ছিল। ঐ দেশেই ছিল এক কুঠার। কুঠারের ছিল দুই মেয়ে। কুঠারেরা খুব গরিব ছিল। কুঠারের দুই মেয়েই ছিল খুবই সুন্দরী। দুই বোন বনে কাঠ কাটতে যায়। রাজাও একদিন বনে যায়। রাজা তখন ওদের দেইখ্যা বুলে, তোমরা এখানে কী কর? মেয়ে দুইডা বুলে, আমাদের খুব কষ্ট। আমরা কাঠ বিক্রি কইরা বুড়া বাপ-মাকে খাওয়াই। এদিকে দুই বোন গল্প কইরতে কইরতে বুলে— ছোট বুইনে বুলে, বুনো আমার ছয় কুড়ি ছেলে একটা মেয়ে হবে। আর বড় বুইনে বুলে আমার একটা ছেইলাই হবে। এই কথাডা রাজা শুইনতে পায়। শুইনতে পাওয়ার পর রাজা চইলা যায়। পরের দিন আবার রাজা আইসাছে বনে। সেদিন অনেক টাকাপয়সা-মোহর-কাপড়চোপড় ম্যালা কিছু আইনেছে। লিয়া আনার পরে জিগাস কইরাছে দুইজনকে যে ছয় কুড়ি একটা মেয়ে কার হবে? তখন মাইয়াটা [ছোট মেয়ে] বুইল্যাছে, আমার। তো রাজা কিছু না বুইলা চইলা গেল। মাইয়া দুইডা কাপড়চোপড় লইয়া বাড়িত যায়। বাড়িত যাওয়ার পর ওদের মা জিগাস করে, ক্যারে, এই সব কুইনঠে পালি? তখন মেয়ে দুইডা বুলে, মা রাজা আমাদের দান কইরেছে। মেয়েরা মাকেও একটা কাপড় দেয়। তখন রাজা ঐ ছোট মাইয়াকে বিয়া করে। যখন সন্তান হওয়ার সময় হুলো তখন ছয় সতীনে বুইললো কি, তুমি এখন বাণিজ্যে যাও। এইভাবে বইসা খাইলে ভাণ্ডার ফুরায়া যাইবে। সন্তান হওয়ার সময় যা করা লাগে আমরা ছয়জনে করব। তুমি বাণিজ্যে যাও। অন্য রানিদের জ্বালা সহ্য কইরতে না পাইরা রাজা বাণিজ্য কইরতে যায়। রাজা চইলা যাওয়ার পর ছয় সতীন যুক্তি কইরা কাঠের পুতুল যে তৈরি করে তার বাড়িত গেইলছে। যাইয়া সেইখান থেইকা ছয় কুড়ি একটা কাঠের পুতুল আইনছে আর কুমারের বাড়ি থেইকা ছয় কুড়ি একটা মাটির হাঁড়ি আইনছে। লিয়া আনার পর একটা ঘরপন সাজায় রাইখ্যাছে। এদিকে ছোট রানি ছয় সতীনেক জিজ্ঞাস কইরছে, বুনো তুমাদের দ্যাশে সন্তান হয় কী কইর‍্যা? ছয় সতীনে বুইলেছে চোখ বাইন্ধ্যা। সন্তান হওয়ার সময় প্রথমে একটা মেয়ে তারপর ছয় কুড়ি ছেলে হয়। তখন ছয় রানি নাড়ি সহকারে ছয় কুড়ি ছেলে একটা মেয়েক মাটির হাঁড়িত রাইখ্যা দেয়। আর কাঠের পুতুলগুলা ছোট রানির সামনে রাখে। কিন্তু ছোট রানি কাঁদন ঠিকই শুইনছে। ছয় সতীনে মানুষ ডাইকা রাতারাতি নদীতে ভাসায়া দেয় তাবৎ হাঁড়ি। ছোট রানিক যাইয়া বুইললো যে তোমার কাঠের সন্তান হইয়াছে। পাইলা ভাসতে ভাসতে মাইল্যানির ঘাটে যাইয়া ঠেইকাছে। পাতিল ঘাটে ঠেকার সাথে সাথে বাগানে ফুল ফুইটাছে। লোকে তখন বুলাবুলি শুরু কইরাছে, তোমার বাগানে রাজার ছেইলামেয়ের পা পইরাছে নাকি যে বাগানে ফুল ফুইটাছে। যে বাগানে এক যুগেও ফুল ফুটেনি সেই বাগানে এত তাড়াতাড়ি ফুল ফুইটলো! মাইল্যানির ঘাটে হাঁড়ি ঠেকার পর মাইল্যানি ঘাটে ঠেকা হাঁড়ি খুইলা দেখে যে একটা ফুটফুটে মেয়ে। অন্য হাঁড়ি খুইলা দেখে সব ছেইলা। মাইল্যানির ছেলামেয়া নাই বইলা মাইল্যানির খুশি কত! মাইল্যানি বুলছে, এত দিন আমার কোনো ছেলামেয়া হয়নি আর আইজ আমার কপালে এত ছেলামেয়ে আইল। মাইল্যানি তখন পাইক-পাইদারি নিয়া নাড়ি ছেদন-মেদন কইরা লালনপালন শুরু কইরলো। দাস-দাসী লাগাইল। খাওয়াই-দাওয়াই বড় কইরা একটা ইস্কুলে ভর্তি করাইল। ঐদিকে ছয় রানি শুনতে পাইয়াছে যে এক মাইল্যানির বাড়িতে বড় হইয়া ইস্কুলে ভর্তি হইয়াছে। কেননা রাজা যদি শুনতে পায় তাহলে তো আমাদের থুবে না। কারণ আমরা তো বুলাছি যে কাঠের ছওয়াল মেয়ে হইয়াছে। তখন ছয় সতীনের কেউ গুল্লা, কেউ জিলপি যে যেরকম পারে তৈরি কইরা চইলা গেছে সেই ইস্কুলের মাঠে। বড় বুইনে বুইঝাছে। বড় বুনে বুলছে, ভাই আমাদের পেছনে শত্রু আছে। তাই আমাদের ঐ সব খাওয়া হবে না। তবে যুদি খাইতেই হয় প্রথমে কুত্তা বিলাইকে খাওয়াব। ওসব মিষ্টি কুকুকে খাওয়াল্‌ছে। আর কুকুর মইরা গেলছে। বাড়িত আইসা মাইল্যানিক বুইলছে, মা আমাদের এখানে আর থাকা হইবে না। মাইল্যানি বুলছে, কেন এখানে থাকা হইবে না? তে মা আমাদের ইস্কুলে জিনিস বিক্রি করতে আইসাছিল ছয় জন্তু সেইগুলা খাইয়া কুকুর মইরা গেলছে। মাইল্যানি বুইলছে, বাবা এতদিন তোমাদের লালন-পালন করনু তোমরা চইলা যাও। সবাই মিল্যা ওর বাবার রাজ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিছে। তো যাইতে যাইতে এক অরণ্য-জঙ্গল পরছে।

তো ওদের বুইন ভাইবছে এদের লিয়া আমি কুইনঠি যাই? ওদের বুইন ছিল বুদ্ধিমতী। সে এক গাছের লতাপাতা আর এক গাছের মুথা তুইলা কপালে তিলক দেয়। আর এক ভাই খবিশ হইয়া বনে পালাইয়া যায়। সব ভাই যখন খবিশ হইয়া পালায় গেল তখন বুইনডা গাছের ওপর উইঠ্যা কাইনতে লাইগাছে। আরেক দেশের রাজপুত্র ওদিক দিয়া যাইছে। যাইছে বনে হরিণ শিকার করতে। তো আরো বেশি কইরা কাইনতে লাইগাছে। ওই ভাইবছে, আজ আমার ভাইদের এ শেষ কইরা দিবে। রাজার ছাওয়াল গাছের গোড়াত বইসা আছে, দেইখ্ছে গাছ বাইয়া পানি পায়ে পইড়ছে। রাজকুমার দেইখছে নুনথা পানি। নিশ্চয় কোনো মানুষের চোখের পানি। রাজকুমার গাছে উইঠ্যা দেখে একটা সুন্দরী কইন্যা। রাজকুমার সেই মাইয়াক লিয়া তার দেশে চইলা যায়। গিয়া কইন্যাকে বিয়া করে। এক এক কইরা বছর চইলা যায় পেটে সন্তান আসে। সন্তান হয়। সন্তান বড় হয়। তাও কইন্যা হাসে না, কথাও বুলে না। শ্বশুর তখন বুলে, মা তুমি বুনে থেইকা আইসাছো তো তুমি মা-বাপের কথা বুল না। কারো কথাও বুল না। খালি তুমি কাঁদ। তখন কইন্যা বুলে আমার একটা শর্ত যদি পূরণ কইরতে পারেন, তাহলে আমি খুশি হব। বুলছে আমার ছয় কুড়ি ভাই আছে। তো এতদিন বুলনি? তো কোথায় আছে তারা? কইন্যা বুলছে এক বনে আছে। ওদিকে কাঠ বিয়ানের জন্য ওদের মাকে রাজা বুনোবাস দিছে। কইন্যা বুনে শ্বশুরের লোক নিয়া যায়। তাদের সগ্লার হাতে একটা কইরা প্যান্ট আর পিরান। মাইয়াডা গাছের ওপর উইঠ্যা পরছে আর বুলতে শুরু কইরাছে। আর ভাইরা ভাইবছে এতদিন কি আমার বুন বাঁইচা যাইছে? ডাক শুইনা এক এক কইরা সব খবিশ আসে। রাজার নাপিত একজনের লোম কাটে, আর সব মানুষ হইয়া যায়। সগ্লেই মিইলা বইনের বাড়িতে গেল। বাপের রাজ্যে সগ্লে যাওয়ার পথে ওর মায়ের সাথে দেখা হয়। তখন সব খুইলা বুলে। বাপের রাজ্যে যাইয়া সব বুলে। রাজা সব বুঝতে পাইরা ছয় রানিক মাইরা ফেইলা ছোট-রানি আর ছেলেদের নিয়া শান্তিতে বাস কইরতে লাইগলো।

কথক : রাজশাহী জেলার বাঘা থানার মশিদপুর গ্রামের মোঃ আলমগীর হোসেন

সুয়ো-দুয়ো রানি

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার দুই বউ— সুয়োরানি ও দুয়োরানি। দুয়োরানিকে রাজা পছন্দ করলেও সুয়োরানির শয়তানির কারণে দুয়োরানীকে বারবার রাজার কাছে কালার কইরে দেয় সুয়ো। সেখুন একদিন দুয়োরানি অনেক কাজ কইরেছে। সেখুন সবাই ভালোমন্দ খাইছে, কিন্তু দুয়োরানির জন্য কেউ কিছু রাখেনি। তখন দুয়োরানি খুদের লাড়ু বানাইছে। বানাই খাইছে। খায়ে ছাদের উপর যায়া শুয়ে আছে। তখুন শুকপাখি ছাদের উপর দিয়ে উইড়ে যাচ্ছিল। তখুন দুয়োরানির দাঁতের ফাঁকে খুদ দেইখে খাইতে আসে। খাইতে খাইতে দুয়োরানির সব দাঁত খাইয়ে লেয়। তারপর শুকপাখি মনে কইল্ল যে এই বেচারির তো এমনিতেই দুঃখ-কষ্ট তো এই বইলে তাক সোনার দাঁত লাগায় দিছে। যখন দাঁত লাগায় চইলে যায় সেখুন সুয়োরানি পুচ কইল্ল তো দুয়োরানি সব কথা খুলে বইল্ল। সুয়োরানি একদিন হিংসা কইরা বাড়ি থেকে তাড়ায় দিল। যাইতে যাইতে দুয়োরানি একটা নদীর ধারে যায়, তো সেখানে এক বুড়ির সাথে দেখা। বুড়ি সেখুন উকুন বাছতে কইসে, সেখুন বুড়ির মাথার সব উকুন তুইলে দিছে। তারপর ভাত পাক করতে কইসে ভাত পাক করছে। তারপর বুড়ি ঐ নদীত তিন ডুব দিতে বুলছে, সেখুন প্রথম ডুবে দুয়োরানি সুন্দরী হয়ে গেছে। আর যখন ডুব দিছে মেলা গয়নাগাটি পাইছে বুইলে দুয়োরানি চইলে আইছে রাজবাড়িতে। সুয়োরানি সব শুনার পর ওইও গ্যাছে। যায়ে বুড়ি যা বুলছে তার উল্টা করছে। বুড়ি তখুন ডুব দিতে বুলছে তিনডা সেখুন প্রথম ডুবে সুয়োরানি আরো সুন্দরী হয়ে গেছে। তারপরে দুইডা ডুবে অনেক সোনাদানা পাইছে। সেখুন তিনডা ডুব দেওয়ার পর আরো কিছু পাবে বলে আবার ডুব দিছে, সেখুন সোনাদানা সব পুকুরে থাইকি গেল আর সুয়োরানি কুৎসিত হয়ে গেল। সেখুন যখন রাজদরবারে গেছে রাজা ওক তাড়ায় দিয়ে দুয়োরানির সাথে ঘর-সংসার কইরে থাকতে লাগলেন। আমার গল্প এইখানে সমাপ্ত হলো।

কথক : রাজশাহী জেলার পবা থানার বড়গাছি গ্রামের মোছাঃ ইসমত আরা

শাপলাবতী

এক দেশে এক রাজার সাতটি ছেলে আর ছিল একটি সুন্দরী মেয়ে। তার নাম ছিল শাপলাবতী। রাজার সাত ছেলের বিয়ে দিয়েছিল। বউগুলো শাপলাবতীকে দেখতে পারত না। একদিন শাপলাবতীর বান্ধবীর বিয়ে ঠিক হলো। শাপলাবতীকে দাওয়াত দিল। তখন শাপলাবতী তার বড় ভাবীর কাছে একটা ভালো শাড়ি চাইল। তার ভাবী বলল, আচ্ছা দিচ্ছি। তবে আমার শাড়ির যদি কিছু হয় তাহলে তোমাক কেটে সাত টুকরা করব। তারপর সেই শাড়ি নিয়ে শাপলাবতী তার বান্ধবীর বিয়েতে চলে গেল। বিয়ে থেকে বাসায় আসতে শাপলাবতীর রাত হয়ে গেল। সে ভাবল, এখন শাড়িটি থাক কাল সকালেই ভাবীকে দিব। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন তার বড় ভাবীরা সেই শাড়িতে লাল দাগ করে দিল। বলল যে শাড়িতে এই লাল দাগ লাগল কী করে? ভাবী আমি জানি না, আমি তো শাড়িতে কোন দাগ লাগাইনি। তারপর তার সাত ভাবী তাকে মেরে ফেলে সাত টুকরা করে তাকে বাড়ির পাশে পুঁতে রাখল। শাপলাবতীর সাত ভাইও বাসায় ছিল না। অন্য দেশে বাণিজ্যে গিয়েছে। সেই সুযোগে সাত বউ শাপলাবতীর এই পরিণতি করল। যেখানে শাপলাবতীকে পুঁতে রেখেছিল সেই জায়গায় একটি লাউগাছ হলো। সেই লাউগাছে অনেক লাউ ধরল। সাত ভাবী সেই লাউ খেত। লাউগুলো ছিল খুব সুস্বাদু। একদিন শাপলাবতীর চাচি তাদের বাসায় আসল এবং লাউগাছটি দেখতে পেল। তার চাচি সেই লাউ পাড়তে গেল এমন সময় লাউগাছ কেঁদে কেঁদে বলল, চাচি আমাকে বাঁচাও। তার চাচি ভয় পেল এবং বউদের বলল যে লাউগাছটি কাঁদছে কেন? আর শাপলাবতীই কোথায়? তাকে তো দেখছি না। সাত বউ বলল যে শাপলাবতী তার বান্ধবীর বিয়ে খেতে গেছে। তারপর সাত ভাবী পরামর্শ করল যে এই লাউগাছটিকে কেটে নদীতে ফেলে দিতে হবে এবং তারা তাই করল। তখন গাছটি পানিতে ভাসতে ভাসতে একটি শাপলাফুল হয়ে গেল। ব্যবসা শেষে সাত ভাই নৌকায় করে আসছিল। পানিতে সেই শাপলাফুলটা দেখতে পাই সাত ভাই বলল যে আমাদের বোন শাপলাফুল খুব পছন্দ করে তার জন্য ফুলটি তুলে নিয়ে যাই। তাই বলে তারা শাপলাফুলটি তুলে নিতেই পানি রক্তের মতো লাল হয়ে গেল। আর সেই শাপলাফুল থেকে বের হয়ে আসল তাদের বোন শাপলাবতী। তার কাছ থেকে সাত ভাই ভাবীদের অত্যাচারের সব কথা শুনল। তারপর তাকে নিয়ে বাসায় গেল। তাকে দেখে সাত ভাবী অবাক হলো। সাত ভাই ভাবীদের শাস্তি প্রদান করল। শাপলাবতীকে একটা সুন্দর রাজকুমারের সাথে বিয়ে দিল।

কথক : রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার অন্তর্গত কুটিপাড়া গ্রামের আঞ্জুমান আরা

কৃষকের মেয়ে

এক কৃষকের একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। কিন্তু মেয়েটি যখন ছোট তখন তার মা মারা যায়। কিছুদিন পর কৃষক আরও একটি বিয়ে করে। সেই বউটি অর্থাৎ মেয়েটির সৎমা তাকে দেখতে পারত না। কিছুদিন পর কৃষকের বউয়ের একটি মেয়ে হলো। মেয়েটি তেমন সুন্দরী না। কৃষকের বউ বড় মেয়েটিকে দিয়ে বাড়ির সব কাজ করায়। আর ভালো ভালো খাবার তার নিজের মেয়েকে দেয়। সুন্দরী মেয়েটি সব কিছু সহ্য করে তবুও সেই বাসায় থাকে। সেই দেশের রাজা তার ছেলের জন্য সুন্দরী বউ খুঁজছিল। গ্রামে তা ঘোষণা করা হলো যেন সকল বাড়ির মেয়েদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়। কৃষকের বউ তার নিজের মেয়েকে খুব সাজিয়েগুছিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায়। আর সৎমেয়েকে বাড়ির সব কাজ করতে বলে। তারা চলে যাবার পর মেয়েটি মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে বনের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছিল। তাকে দেখে একজন যুবক বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে মেয়েটি তার জীবনের দুঃখের কথা সব বলতে থাকল। ঐ যুবক সব কথা শুনে বলল, চল আমার সাথে। মেয়েটি তার সাথে সাথে রাজপ্রাসাদে গেল। মেয়েটি তাকে বলল, এ তো আমাদের রাজার বাড়ি। সে যুবক বলল, আমি এ রাজপ্রাসাদের রাজপুত্র। আমার জন্যই মেয়ে দেখা হচ্ছে। আমি তোমাকেই বিয়ে করব। মেয়েটি বলল, আমার সৎমা আছে এখানে। রাজপুত্র বলল, কিছু হবে না। তারপর রাজারও মেয়েটিকে পছন্দ হলো এবং খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হলো। তার সৎমাকে রাজা শাস্তি-প্রদান করল। তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস শুরু করল।

কথক : রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার অন্তর্গত কুটিপাড়া গ্রামের মতিউর হক

কৃষক ও তার বোকা স্ত্রী

এক গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক ছিল। সে এত গরিব ছিল যে দিন আনতো, দিন খেত। একদিন সে অন্যের জমিত কাজ করছিল, জমি খুঁইড়তে খুঁইড়তে একটা মাটির হাঁড়ি পায়। সেই হাঁড়িত অনেক সোনা-দানা, পয়সা প্রভৃতি ভর্তি ছিইলো। তখন কৃষক সেই হাঁড়ি বাড়িত লিয়া আইসে। বাড়িত লিয়া আসার পর সক্ [সব] ঘটনা ওর স্ত্রীক বুলে। স্ত্রীক শুদায়, এটা কুইনঠে লুকাবে? তখন স্ত্রী বুলে, এটা ওদের ঘরে লুকাবে। তাইলে কেউ জাইনবে না। স্ত্রীক আরও বুলে, তুমি কাহোকো বুইল না। তুমি যদি অন্যেক বুইলা দ্যাও সকলেই জাইনতে পাইরবে। তখন ওরা আইসা লিয়া যাইবে। এই বুইলা কৃষক ঘুমায় পড়ে। এদিকে, ওর স্ত্রীর কথাডা অন্যেক বুলার জন্য পেটের মইধ্যে ভাটুস-ভুটুস কইরতে থাকে। সকালবেলা ঘাটে থালাবাসন মাইজতে যাইয়া অন্য মহিলাদের সক্ ঘটনা বুইলা দিছে। বুইলাচে আমার স্বামী জমিত কাজ কইরতে যাইয়া এক হাঁড়ি টাকা-পয়সা পাইছে। তুই আবার কাহ্কো বুলিস না। আমার স্বামী কাহ্কো বুইলতে মানা কইরেছে কিন্তু তুই আমার খুব কাছের তো তাই তোকে বুননু [বলেছি]। ঐ মহিলা আবার অন্যেক বুইলেছে। এইভাবে বুইলতে বুইলতে গোটা গ্রামের লোক জাইনা গ্যাছে। জমির মালিক শুইনতে পাইয়া ঐ কৃষকের বাড়িত চইলা গ্যাছে। যাইয়া বুলছে, কি রে তুই নাকি সোনার হাঁড়ি পাইছস? তখন কৃষক বুলছে, এটা মিথ্যা কতা। আর আমি যদি পাই তাইলে রাইখনু কুঠি? সবাইকে বোঝালে ওরা চইলা যায়। কৃষকের স্ত্রী ছিল বোকা ধরনের। সবাই চইলা যাওয়ার পর কৃষকের স্ত্রী বুইলছে, তুমি পাছো তো মিথ্যা বুইল্যা ক্যা? কৃষক বুইলছে, আমি যদি পাইয়া থাকি তাইলে কুইনঠে রাখিছি? ওর স্ত্রী বুইলছে, তুমি যে ঘরের মাইঝার মাটির তলে রাইখলা। কৃষক বুলে, তুমি যদি সবাক একথা কইয়া থাকো তাহলে সগ্লাই আমার ঘর খুঁইজতে আইসবে। তখন তুমি কী বুইলবা? স্ত্রী বুইলছে, ক্যান বুইলবো, তুমি ঘরের মধ্যে রাইখচো। স্বামী তখন ওর স্ত্রীক কিছু না বুইলা চইলা যায়। স্ত্রী ঘুমায় পইড়লে কৃষক হাঁড়িডা লিয়া যাইয়া আরেক জায়গায় পুঁইতা রাখে। কৃষক তখন ঘরে চইলা আইসা মুনে মুনে ভাবে কী কইরা স্ত্রীর বুকামু শুইধরানো যায়। সে একটা বুদ্ধি বাইর করে। পরদিন সে একটা রুটি গাছে ঝুলায়, মাছ মাঠে রাখে, আর ছিপে একটা ব্যাঙ বাঁধায়। অইসা ওর স্ত্রীক বুলে, চল কোথাও বেড়াই আসি। সেদিন আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। স্ত্রী যাইতে রাজি না হইলেও অবশেষে যাইতে চায়। যাইতে যাইতে কৃষক বুইলছে, দাঁড়াও তো আমি নদীত ছিপ দিছিলাম কি উইঠলো?— এই বুইলা ছিপ তুইলাছে দ্যাখে ব্যাঙ। আবার যাইতে যাইতে মাঠে মাছ আর গাছে রুটি পায়। কৃষকের বউ ভাইবছে, কি হইলো গাছে রুটি, মাঠে মাছ আর ছিপে ব্যাঙ! স্ত্রী বাড়িত অইসা সবাক বুলে, বৃষ্টি হইলে নাকি এসব পাওয়া যায়। কৃষক মুনে মুনে ভাবে, এইবার মুনে হয় কাজ হইবে। গ্রামবাসী কৃষকের বাড়ি আইসলো সত্য ঘটনা জানার জন্য। তখন কৃষক বুলে, আমি যদি পাইয়া থাকি সোনা তাইলে কুইনঠে রাখিছি খুঁইজা দ্যাখো। আমার স্ত্রীর মাথা খারাপ হইছে নইলে কেউ কুনোদিন কাউকে বুলে সোনা পাইলে। তখন গ্রামবাসীরা বুলে, তোর বউয়ের মাথা খারাপ হয়নি, ভালো আছে। কৃষকের স্ত্রীকে ডাইকা সগলে জিজ্ঞেস করে, সে কুন্ঠে পুঁইতা রাখছে? কৃষকের বউ বুলে, ঘরের মাইঝায়। সগ্লাই মিলা কৃষকের ঘরের মাইঝা খুঁড়ে কিন্তু কিছুই পায় না। তখন সে সবাক বুলে যে, আপনারা যান। আমি পরে খুঁইজা দেইখপো। সবাই মিলা বিচারকের কাছে নালিশ কইরাছে। বিচারের দিন বিচারক কৃষকের বউওক ডাইকা পাঠায়ছে। বিচারক সক্ [সব] ঘটনা বুইলতে বুলে। সেদিন বৃষ্টি হলো, মাঠে মাছ পাইলা না? আকাশ থেইকা রুটি পাইলা না? ছিপে ব্যাঙ উইঠলো তার আগের রাইতে হাঁড়ি পাওনি? কৃষকের বউয়ের কথা শুইনা বিচারকসহ সগলাই [সকলেই] হাসি পাইরেছে। সকলে মিলা বুইলছে ঐ মহিলার মাথা খারাপ হইছে নইলে কেউ এমন আবোলতাবোল বুলে। কৃষক তখন ছাড়া পেল বিচারে। সেই ধনসম্পদ নিয়ে অন্য দেশে তারা সুখেশান্তিতে বাস কইরতে লাইগ্লো।

কথক : রাজশাহী জেলার পবা থানার বড়গাছি গ্রামের মোছাঃ মাজেদা

আইনাল হক-আয়নাবিবি

আইনাল হক আয়নাবিবিরা ভাই বোন। তখন আয়নাবিবির কিন্তু প্রেম হয় কিন্তু নিশি রাইতে। উই রাইতে চইলি যায়। দেশের মানুষ বুলে এই মিয়াজ যায় কতি? তোমার বোন যায় কতি। মেলা রকম গীবত গায়। আল্লার ওলি যারা হয় তারে তো মেলা গীবত গায়। কিন্তু পরীক্ষাত গেলে পাবে দেখা যাচ্ছে যে আসলেতে নকল নাই। তখন একটা নাম পইড়ি যায় ওলি। তো তখন ঐ রাত্রে চইলি যায়। তখন ঐ আইনাল হক বুঝলে যে আমার বোন কতি যায় আমি পরীক্ষা করব। উই গেল, আর উই পিছে পিছে যাইতে থাকল। যায়া দেখে যে, আমার বোন এক জঙ্গলে ঢুইকি বটগাছ ছিল ঐ গাছ আল্লার কুদরতে ফাইটি গেল আর মধ্যে ঢুইকি গেল। আয়নাবিবি ঢুইকি গেল। ঢুইকি যখন গেল তখন গাছ জোর লাইগি গেল। তখন আইনাল হক কী করল। ঐ ছেয়ায় যায়া পাতার মধ্যে লুকাই থাকল। দেখি আমার বোন কী করে। তখন দেখল যে ফেরেশতা চইলি আইল। আল্লার হুকুমে ফেরেশতা চইলি আইল। উনিশটা ফেরেশতা আর ঐ মা আয়নাদি বিশটা হয়ে গেল। ওরা তখন জিকির করতে লাগল। মারিফাত হলো জিকির। আলো। নূর। তখন ঐ জিকির করতে থাকল। জিকির করতে করতে করতে জিকির হয়া গেল। বেহেশতের থেইকিই খানা চইলি আইল। তখন একুশটা পাতা আইল খানা খাইতে হইলে পাতা লাগবে। একুশটা পাতা আইল। তখন ঐ গুইনি দেখল একুশটা পাতা। ওরা বুলছে আমরা বিশ জন লোক একুশটা পাতা কেন। তখন আয়নাবিবি গুইনি গুইনি দেখে যে একুশটা পাতা দেখ এই জঙ্গলে আছে একজন। খুঁইজি কেউ পায় না। তখন আয়নাবিবি ধ্যানে বইসি গেল। ধ্যানে না বসলে তো বুলতে পারবি নি। ধ্যানে বইসি দেখছে যে গাছের ছায়াই বইসি আছে আমার ভাই। আইনাল ভাই গাছের মধ্যে বইসি আছে, আইনাল হক নাইমি আইস। তোমার জন্য খানার পাতা আইছে খানা খাওয়ার জন্য। বেহেশতের খানা আইছে। আমি গুইনি দেখছি একুশটা পাতা আমার আছে বিশ জন। আমি জানতে চাই তাইলে আর একজন আছে। এরা খুঁইজি পাইল না। এখন ধ্যানে দেখছি যে গাছেত ছায় বইসি আছ। ভাই নাইমি আইস। নাইমি আইসি তখন বোনের পায়ের উপর পইড়ি গেল। বোন তুমিই আমার বড়, তোমার অসীম ক্ষমতা, তোমার কুদরতি শক্তি, তোমার পায়ের উপর আমি পইড়ি আমি তোমার কাছে মুরিদ হব তুমিই আমার গুরু।

কথক : রাজশাহী জেলার জামালপুরস্থ ওলিবাবার মাজারে আগত রসেনা পাগলি